কবিতা বিকেল

বিজয় উৎসব সংখ্যা ২০১০

বিজয় উৎসব সংখ্যা
১৬ ডিসেম্বর ২০১০

বিজয় উৎসব সংখ্যা সম্পাদক
রাজন নন্দী

প্রকাশক
মাহমুদা রুনু

ভি-ম্যাগাজিন ডিজাইন এন্ড ডেভলপমেন্ট
রাজন নন্দী

যোগাযোগ
মাহমুদা রুনু
kobitabikel@gmail.com

কৃতজ্ঞতা:
www.bangla-sydney.com

সম্পাদকীয়

‘স্বাধীনতা’র বয়স আমার, আমাদের যে কারোর চাইতে বেশী। আর আমাদের স্বাধীনতার বয়স ও প্রায় চার দশক। তবু কি পেয়েছি আর কি পাইনি – তর্কটির ইতি টানা আজও দুষ্কর! অনিবার্য ভাবে আমরা এ ওর দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে দায় সারি। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে শ্লাঘা বোধ করি। একবারও কেন ভাবি না যে, কেউ এসে কিছু করে দিয়ে যাবেনা। যা করার তা নিজেদেরই করতে হবে। অভিযোগ তাই বাতুলতা।

আসুন না, হাতে রাখি হাত। এর আগে ঠিক এইভাবে স্বাধীনতা এসেছিল। আর আমরা প্রায় প্রত্যেকে স্বাধীনতার চেয়েও তরুণ। ভয় কি?

সবার জন্য বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

সূ চী প ত্র

বিজয় উৎসব সংখ্যা
১৬ ডিসেম্বর ২০১০

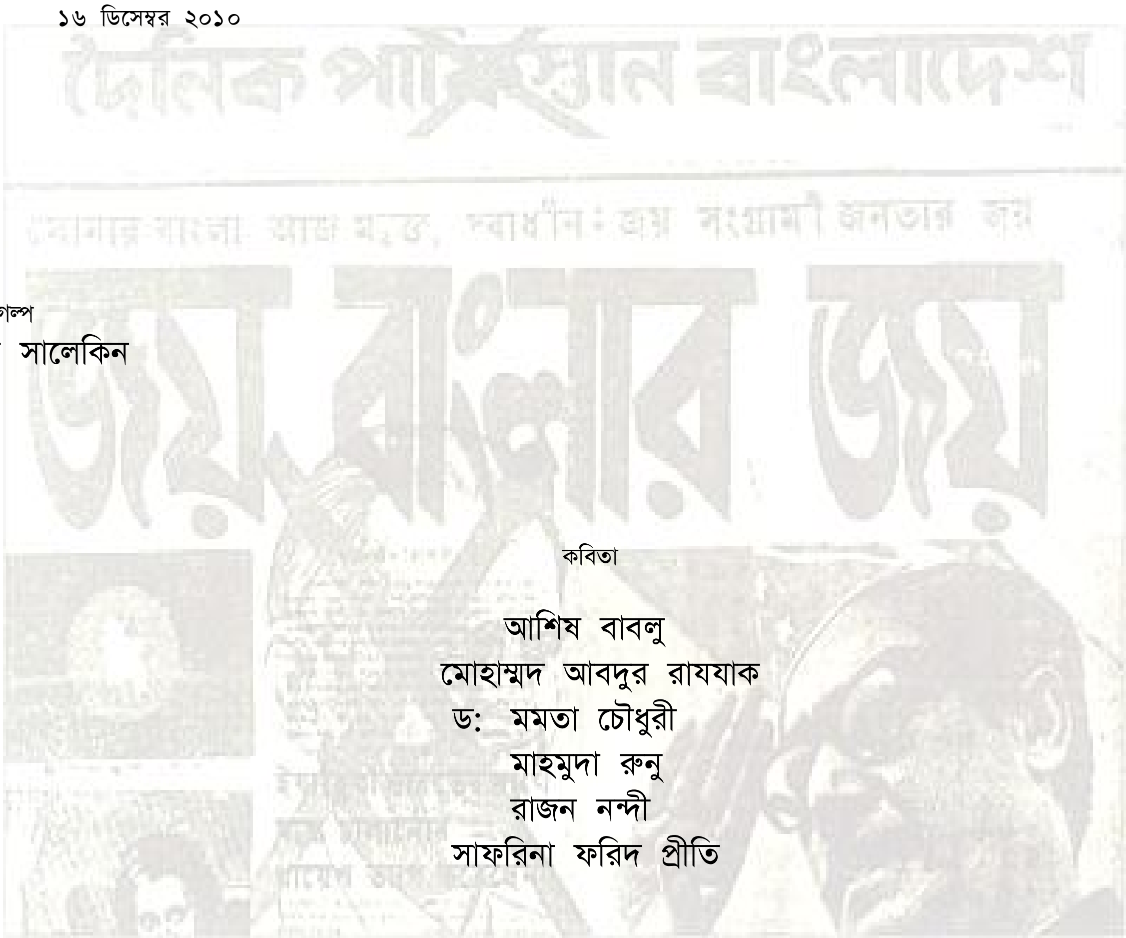
দৈনিক পাকিস্তান বাংলাদেশ
সোনার বাংলা আজ মুক্ত, স্বাধীন : জয় সংগ্রামী জনতার জয়
জয় বাংলার জয়

গল্প

সিরাজুস সালেকিন

কবিতা

আশিষ বাবলু
মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক
ড: মমতা চৌধুরী
মাহমুদা রুনু
রাজন নন্দী
সাফরিনা ফরিদ প্রীতি

ছোটগল্প

আজাদুল আলম
জাফির হোসাইন

কথোপকথন - এমন যদি হোতো

সিরাজুস সালেকিন

**এই যে ফরহাদ ভাই, ক্যামন আছেন ? অনেকদিন আপনার সাথে দেখা নেই। তাই দেখা করতে এলাম।
তা আপনি বুঝি বাইরে বেরোচ্ছেন?**

আরে, সেলিম ভাই যে, কবে এলেন? আপনি তো বিদেশে ছিলেন - প্রায় ২০ বছর পর দেশে ফিরলেন শুনলাম। খুব ভালো লাগলো আপনি দেশে ফিরে এসেছেন বলে। ভাবী, ছেলে-মেয়েরা ওরা সব কেমন আছেন? ওরা ও কি এসেছে আপনার সাথে?

আপনার ভাবী আর ছেলে-বউ - মেয়ে-জামাই - নাতি-নাতনী সবাই মিলেই এসেছি। আমরা ঠিক করেই এসেছি যে এখন থেকে বাংলাদেশেই থাকবো, আর বিদেশ না - অনেক তো হোলো।

ভাই, খুব ভালো খবর। আপনার মত অনেকেই এখন দেশে ফিরে আসছে। আপনাদের মেধা আর অভিজ্ঞতা আমাদের খুব কাজে লাগবে - আপনাদের মত লোকই তো আমাদের দরকার এখন।

তা চলুন না আমার সাথে, স্থানীয় শহীদ মিনারে। আজ তো বিজয় দিবস। এলাকার সবাই তো এখন ওখানে। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। যেতে যেতেই কথা হবে।

আপনি খুব ব্যাস্ত বুঝি? শুনলাম আপনি নাকি এবার আমাদের এলাকার এম পি হয়েছেন?

আর বলবেন না ভাই - এলাকার লোকজন আমাকে প্রায় জোর করেই দাড় করালো, এম পি বানালো। আর এম পি হওয়ার পর জীবন কি আর আগের মত আছে? ওখানেই থাকছি স্থায়ীভাবে। শুনেছেন বোধহয় যে সরকার নতুন নিয়ম করে দিয়েছে - এলাকার স্থায়ী লোক ছাড়া বাইরে থেকে এসে কেউ নির্বাচন করতে পারবেন না। নির্বাচিত এম পি কে এলাকায়ই স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে।

খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। এমনটিই তো হওয়া উচিৎ। তা ভাই, দেশের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার মান তো শুনলাম খুব ভালো।

ঠিকই শুনেছেন। এলাকার স্কুলে এখন আর ছাত্র-ছাত্রীর জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন আর একটা স্কুল তৈরী শেষ হোলো বলে। গ্রামের কলেজটা এবার আই এ তে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। ছাত্র-ছাত্রীও বেড়ে দ্বিগুন।

ঢাকা থেকে ভালো ভালো সব ছেলে-মেয়েরা এখানে এসে ভর্ত্তি হচ্ছে। মাস্টারদেরও ভারী সুনাম। সব মিলিয়ে এলাকাটাকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না। শহরের সব সুবিধাই এখানে পাবেন। আমাদের গ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত সরাসরি রাস্তা হয়েছে, ট্রেন লাইনও শেষ হবার পথে।

এখন এখানে অনেক সরকারী অফিসের শাখাও চলে এসেছে। মানুষকে এখন সামান্য কারণে ঢাকা শহরে বা জেলা শহরে ছুটতে হয় না। মানুষ এখন খুব সুখী।

**খুব ভালো খবর। এ তো একেবারে বিদেশী সমাজ ব্যাবস্থার মত। ডিসেন্ট্রালাইজড সিস্টেম।
তা ভাই, এবার গ্রামে ধানের ফলন কেমন হোলো?**

এবারে ভাই বাম্পার ফলন। চাষীরা সময়মত সার আর বীজ পেয়ে খুব খুশী।

এখন আর ওদের ঘুষ দিয়ে ওসব জোগাড় করতে হয় না। আমাদের গ্রাম ব্যাংকের কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছে, সময়মত বীজ আর সার দিচ্ছে, ঋন দিচ্ছে। গ্রাম ব্যাংকের শাখা এখন চৌষট্টি হাজার গ্রামে - ওরাই তো আমাদের অবস্থাটা ফিরিয়ে দিল।

আর কৃষি ব্যাংক - ওটাতো কবেই বন্ধ। চাষীদের সাথে ওদের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। ওরা তো শুধু বড়লোকদের ঋন দিত - বিনিময়ে ঘুষ নিত। আর গরীব-অসহায় চাষীদের সামান্য কারণে জেলে ভরতো।

সবচেয়ে মজার কথা হোলো, আমাদের গুদামে শষ্য রাখার জায়গা নেই। চাল, গম রফতানী করে আমরা এখন বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছি। মাছের চাষ হচ্ছে সবজায়গায়। ঘরে ঘরে শাক-সবজীর চাষ হচ্ছে। বাম্পার ফলন হচ্ছে ভাই। মানুষ এখন আর অনাহারে থাকে না। সে জন্য চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি নেই বললেই চলে। আর সব ধরনের অপরাধের জন্যই শাস্তির বিধান আছে। ধরা পড়লে রেহাই নেই, তা সে যেই হোক না কেন।

গ্রামে গ্রামে আজকাল অনেক বাউলদের দেখা যায়, সব গ্রামে নবান্ন উৎসব, পৌষ মেলা আবার ফিরে এসেছে, নববর্ষ উৎসব পালিত হয় সারা দেশে - শহরের চেয়ে গ্রামেই এর আয়োজন বেশী। পুথী-পাঠ, গম্ভীরা, কবিগানের আসর, যাত্রা-পালা - এসব অনুষ্ঠানে আমাদের গ্রাম বাংলা মুখরিত হয়ে থাকে সারা বছরই।

ক্ষেতমজুর, শ্রমিক, কামার-কুমার, জেলে, তাতী - সব ধরনের খেটে খাওয়া মানুষ এখন ভালোই আছে। সরকার ওদের জন্য বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে। ওদের কার্ড দেওয়া হয়েছে। ওরা অর্ধেক মূল্যে চিকিৎসা পায়, ওষুধ কেনে, বাস-ট্রেনে যাতায়াত করে। আগে যেমন সরকার এম পি দের ট্যাক্স ছাড়া গাড়ী আমদানীর সুবিধা দিত - এখন তা আর নেই। আমি তো ট্রেনে-বাসে করেই যাতায়াত করি, আমার কোনো গাড়ি নেই। বছরের শেষে সম্পদের হিসাব দিতে হয় সরকারকে। এমন একটা দেশের স্বপ্নই তো আমরা দেখতে চেয়েছিলাম।

খুবই আশার কথা। কি যে ভালো লাগছে এসব শুনে - মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি।
দেশের রাজনীতির খবর বলেন ভাই। আপনাদের সরকারের তো খুব সুনাম শুনে এলাম বিদেশে।

সেটা তো জনগন বলবে। জনগনের সেবার জন্যই তো এম পি হয়েছি। জনগনই ভোট দিয়ে আমাদের এম পি বানিয়েছেন, মন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা আমাদের সাধ্যমত কাজ করছি।
তবে একটা কথা ভাই সত্যি - নষ্ট রাজনীতি, আখের গোছানোর রাজনীতি - এ সব চিরতরে শেষ।
রাজনীতি আর সেই সাথে ব্যাবসা - এটা এখন একেবারেই উঠে গেছে।
ওরাই তো আমাদের দেশটার সর্বনাশ করেছিল। প্রায় ৪০ বছর লেগে গেল এসব জঞ্জাল দূর করতে।

মানুষ এখন অনেক সচেতন - মানুষ আর আগের মত সুবিধাবাদী ও অসৎ আমলা, উর্দিধারী ক্যাপ্টেন-মেজর-কর্নেল-জেনারেলদের, আবসরপ্রাপ্ত আমলা আর অসৎ ব্যাবসায়ীদের ভোট দেয় না। মনোনয়ন বানিজ্য এখন আর চলে না। সবচেয়ে বড় কথা শুধুমাত্র দলের নাম বেচে কেউ আর নির্বাচনে জিতে আসতে পারে না। মানুষ এখন সৎ ও যোগ্য মানুষদের ভোট দেয়। মানুষ এখন অনেক বেশী সচেতন আর দেশপ্রেমিক।

সবচেয়ে বড় কথা হোলো জামাতের রাজনীতি চিরতরে শেষ হয়ে গেছে - এটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ওদের সবকটা জল্লাদকে ফাঁসীতে ঝোলানো হোলো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানীদের তাবেদারী করেছিল, তারা এখন নিশ্চিহ্ন। আর মানুষ এখন নিশ্চিন্ত। সব ধরনের মৌলবাদ দেশ থেকে বিদায়। সব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সমস্ত দেশে শুধু সরকারী স্কুলেই ছেলে-মেয়েরা পড়ছে। ওখানেই সব বিষয় পড়ানো হয়।
আর ওই যে, দেশের বড়লোকের ছেলেমেয়েরা আগে যে সব বিলেতী-ঢং এর স্কুলে পড়তো - ওসব স্কুল আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওরা এ দেশে থেকেও যেন এদেশের কেউ না - প্যারাসাইটের মত বড় হচ্ছিল। ওখান থেকে বের হওয়া ছেলেমেয়েরা দেশের সাধারন মানুষদের সাথে মিশতে পারতো না। বাংলা ভাষায় কথা বলতে ওদের যেন লজ্জা করতো। যে দেশের মানুষ ভাষাকে রক্ষার জন্য ১৯৫২ তে প্রাণ দিয়েছিল, সে ভাষার অসন্মান আর কত সহ্য করা যায়।

আসল কথা হচ্ছে দেশে আগের মত ঘুষ, পারমিটবাজী, সিন্ডিকেট, সন্ত্রাস, অসৎ রাজনীতি - এসব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ওসব স্কুলে মাসিক দশ-বিশ হাজার টাকা বেতনে এখন আর কারো পড়তে যাওয়ার মত টাকা নেই। বড়লোকের মেধাহীন ছেলে-মেয়েরা টাকার জোরে প্রাইভেট মেডিকেলে পড়ে এখন আর ডাক্তার হচ্ছে না।

আর একটা মজার কথা শুনলাম সেদিন - মানুষ এখন আর মিরজাফর, বা তুই-রাজাকার বলে গালি দেয় না।
এখনকার গালি হচ্ছে - তুই মুজাহিদ, তুই নিজামী,
তুই তারেক-মামুন, তুই পিন্টু-বাবর, তুই মায়া-হাজারী,
তুই আব্বাস, তুই বনখেকো কোথাকার,
তুই সাইফুরের আলু, তুই গোরখোদক ফালু!!!!

সবচেয়ে মজার কথা হোলো যে যত টাকাই কামাই করুক না কেন - সরকারকে ঠিক মত ট্যাক্স অবশ্যই দিতে হচ্ছে। এ থেকে কারও মাফ নেই - আর ট্যাক্স ফাকি দিলে এবং তা ধরা পড়লে ২০ বছর সশ্রম কারাদন্ড - তা সে যেই হোক না কেন। এটাই এখন সবচেয়ে কম সাজা। ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টমস - এসব অফিসে এখন আর লোক চাকরী পাবার লোভ করে না। আর রাজনীতিবিদরা যদি অসৎ-কর্মে জড়িত হয় আর ধরা পড়ে - তবে যাবৎজীবন দন্ড। অনেক অসৎ রাজনীতিবিদ এখনও জেলে পঁচে মরছে। মানুষ ওদের কথা আর মনে করতে চায় না। ওরা এখন অতীত!

বেশ ভালো লাগলো ভাই আপনার কাছে এসব শুনে। তা ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর কি?

কেন? ভালোই তো চলছে। ওখানে এখন পড়াশোনা ছাড়া আর কিছু হয় না। রাজনীতির শ্লোগান সেখানে আর শোনা যায় না। অনেক আগে ৭০ এর দশকে যেমন বিদেশ থেকে ছেলে-মেয়েরা ওখানে পড়তে আসতো, এখন তা আবার শুরু হয়েছে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০০০ বিদেশী ছেলে-মেয়েরা পড়ছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই অবস্থা।

আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন আর ৩০ বছর আগের নোট পড়ে পরীক্ষা দিচ্ছে না, কারণ এখনকার শিক্ষকরা মনে-প্রাণেই শিক্ষক। ছাত্ররা আর অসৎ রাজনৈতিক দলের তাবেদারী করে না। তবে সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার অধিকার ওদের আগের মতই আছে। ওরাই তো এক হয়ে জামাত-শিবিরকে চিরতরে হটিয়ে দিল - যা নাকি আমাদের তখনকার রাজনীতিবিদরা পারেনি, হয়তো বা চায় ও নি।

রাজনীতির সাথে জড়িত সব শিক্ষককে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখন আর রাজনীতি করেন না, লাল-নীল আর গোলাপী বলে এখন আর শিক্ষকদের কোনো দল নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অর্থ উপার্জনের জন্য এখন আর অন্য সব নাম-সর্বস্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে বেড়ান না, আর সে অধিকারও তাদের নেই। ছাত্র-শিক্ষকরা এখন যেন বন্ধু। অবাক কান্ড ভাই!

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও একই চিত্র। মেধাহীনরা এখন আর রাজনীতির জোরে শিক্ষক হতে পারছে না। শিক্ষকরা এখন আর প্রশ্নপত্র ফাস করে না। মানুষগুলো কেমন করে যেন বদলে গেল! আসলে আমাদের নেতার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি নিজে যেমন সৎ, শিক্ষিত, দক্ষ, দেশপ্রেমিক তেমনি কঠোর ও বিচক্ষন।

মেডিকেল কলেজ, কৃষি কলেজ, ইন্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি - এখানকার পাশ করা ছাত্ররা তো দেশ-বিদেশ থেকে সুনাম বয়ে আনছে। ওরা এখন পৃথিবীর সব বিখ্যাত ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে কাজ করছে। তবে কিছুদিন কাজ করার পর আবার তারা দেশে ফিরে আসছে। দেশপ্রেমের এমন উদাহরণ আগে দেখা যেত না ভাই। অবশ্য আমরাও কি ভাই আগে তেমন পরিবেশ ওদের দিতে পেরেছি। অনেক ভালো ছেলেমেয়েরা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, ওখানে বড় বড় সব কাজ করেছে বলে শুনি। তবে এখন আর বিদেশে যাবার হিড়িক নেই বললেই চলে। বরং আপনার মত ওরা অনেকেই এখন দেশে ফিরে আসছে।

খুব ভালো, খুব ভালো। আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির খবর তো বিদেশের কাগজে বসে দেখেছি। কি যে ভালো লেগেছে ভাই!!!

আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি তো এখন সারা দুনিয়ার সেরা। আমাদের কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, পটুয়া, গীতিকার, সুরকার, গাইয়ে-বাজিয়ে - এরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা বলে বিবেচিত হচ্ছে। কি কবিতা, কি গান, কি সাহিত্য, কি চিত্রকর্ম - এ সব নিয়ে সবাই আজ বিশ্বজুড়ে আলোচনা করছে। এই তো গত বছর সাহিত্যে নোবেল পেল আমাদের সেলিনা আহসান, নাম শোনেন নি?

আগে যেমন গানের নামে নাচন-কুর্দন চলতো, সারা শরীর নাচিয়ে, নানা বাদ্য বাজিয়ে শিল্পীরা গান করতো, সে সব চুলোয় গেছে। বেঁচেছি বাবা!!! ওকে কি গান বলে? আমাদের দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে দেশী গান - এর কি তূলনা চলে? রবীন্দসঙ্গীত, নজরুলের গান প্রায় ঘরে ঘরে। আমাদের লালন-হাসন-আলিম-আব্বাসউদ্দীন-রমেশ শীল-রাধারমণ - এরা যেমন জনপ্রিয়, তেমনি আমাদের নতুন শিল্পী-বাজিয়েরাও অসাধারন সব সৃস্টি করে চলেছে। এ সব গান এখন সবার মুখে মুখে।

টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে আগে যেমন বিত্তবানদের, তথাকথিত নামী-দামীদের আধিক্য ছিল - এখন আর তা নেই। আগে টেলিভিশন খুললেই দেখা যেত ওদের যত সব চাকচিক্য, গাল ভরা সব বুলি। মনে হোতো দেশটা বোধহয় ওদের দখলে। সমাজের মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তদের সেখানে আসন ছিল না। এসব চ্যানেল এর মালিকরা রাজনীতিবিদদের পুতুল ছিল। দলের তোষামোদ করাই ছিল ওদের আসল কাজ। বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল ওরা কয়েকজন। এদের সবকটা এখন জেলে পচে মরছে।

এখন টেলিভিশনের খবর দেশের মানুষ বিশ্বাস করে। সব শ্রেণীর মানুষের জন্য অনুষ্ঠান হয়, সবাই অংশগ্রহন করার সুযোগ পায়। আসল কথা, দেশের রাজনীতিটা বদলে যাওয়াতে - সব কিছুই বদলে গেছে।

বাঙালির জাতীয় বিশেষ দিনগুলো ব্যাপক আকারে পালিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি নেই, মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় সম্মান জানানো হয়, অনেক বীর অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর-শ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। একুশে পদক আর স্বাধীনতা-পদক আবার এর আসল গৌরব ফিরে পেয়েছে। আগে যেমন দলীয় লোককে, শাসকদের পরিবারের লোককে এ পদক দেয়া হোতো - এখন তা আর নেই। বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান, সেই সাথে মওলানা ভাসানী, মনি সিং, তাজউদ্দিন, আর সব শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের জীবনকথা স্কুলের পাঠ্য করা হয়েছে। ওরা জানছে কার কি অবদান, কি অসাধারন সব ত্যাগ করেছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ বাঙালিরা। এতে ওরাও দেশের জন্য ত্যাগ করার প্রেরণা পাচ্ছে।

আমার মনে হয়, মানুষ অনেক বেশী দেশপ্রমিক হতে শিখেছে। আগে যেমন আমাদের ছেলেমেয়েদের সামনে খুব একটা বেশী আদশবার্ন মানুষ ছিল না, আজকাল সে রকম আদর্শবান মানুষের সংখ্যা অনেক। সমাজে শ্রদ্ধা, সন্মান, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ফিরে এসেছে। বাঙালি এখন যেন সম্পূর্ন বাঙালি হয়ে গড়ে উঠছে।

খুবই আশান্বিত হোলাম ভাই আপনার কথা শুনে। তা ভাই, আমি কালকেই একটা কাজে নেমে পড়তে চাই। আমি শিক্ষকতা করতাম বিদেশে - এখানে তেমন কোন সুযোগ কি হবে?

আপনি কালকে সকালে আমাদের কলেজে চলে আসুন, আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে বলে রাখবো। তিনি আপনার ইন্টারভিউ এর ব্যাবস্থা করবেন। ইন্টারভিউ এ আপনি বিবেচিত হলে চাকরিটা হয়ে যাবে।
....

হাটতে হাটতে ওরা শহীদ মিনারের সামনে চলে আসলো। ওখানে হাজারো মানুষের ভীড়। স্থানীয় শিল্পীরা গান করছে... জয় বাংলা বাংলার জয়.........

সেলিম মনে মনে ভাবলো - আজকে ১৬ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস। অনেকদিন এ গান শুনিনি। কি রকম যেন লাগছে, চোখে পানি চলে আসলো সেলিমের। দেশ জিনিসটা যে কি - তা যেন টের পাইয়ে দিল ওই গানের সুর। সামনে এগিয়ে ওর দেখা হয়ে গেল ওর পরিবারের সবার সাথে। ওরাও সবার সাথে মিলে-মিশে একাকার।
মনে হোলো যেন স্বপ্ন দেখছে। গত ২০ টা বছর এমন স্বপ্নই শুধু দেখেছে - আজকে তা একেবারে সত্যি........
সবার সাথে গলা মিলিয়ে সেলিম চেচিয়ে উঠলো..... জয় বাংলা...............................

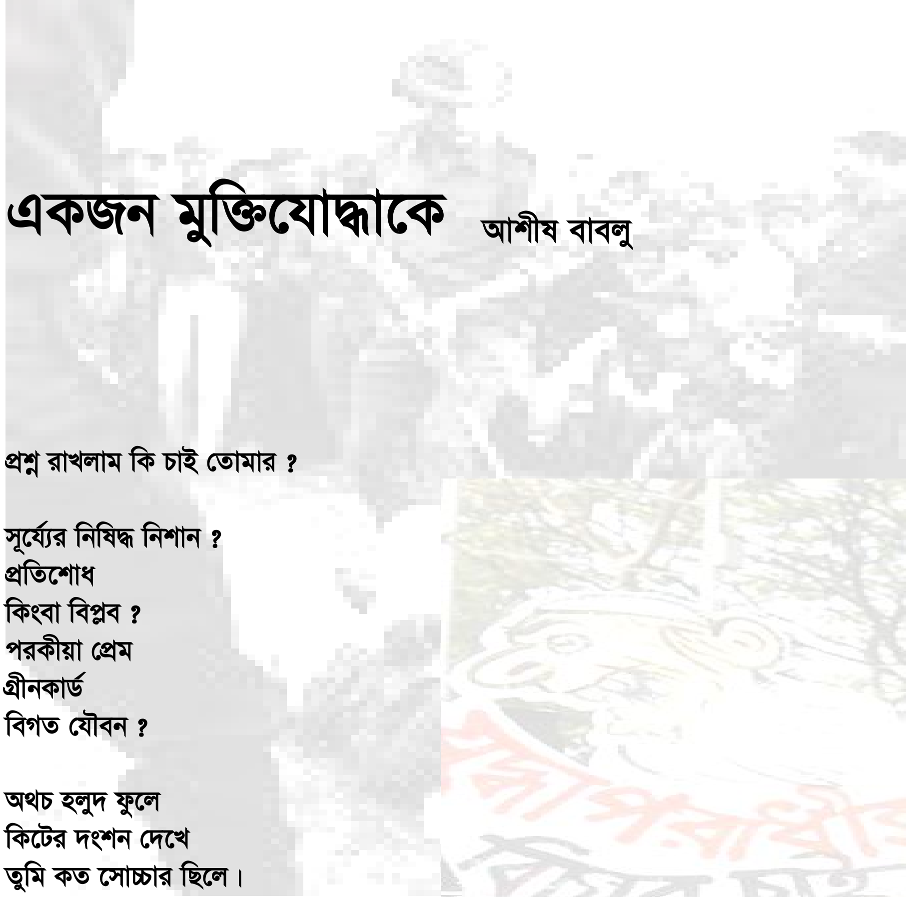

একজন মুক্তিযোদ্ধাকে

আশীষ বাবলু

প্রশ্ন রাখলাম কি চাই তোমার ?

সূর্য্যের নিষিদ্ধ নিশান ?
প্রতিশোধ
কিংবা বিপ্লব ?
পরকীয়া প্রেম
গ্রীনকার্ড
বিগত যৌবন ?

অথচ হলুদ ফুলে
কিটের দংশন দেখে
তুমি কত সোচ্চার ছিলে।

আজ তুমি অসম্ভব ভীরু
ভয় কী ? চেয়ে নাও তোমার কী চাই ?

০০০

আশীষ বাবলু: শিল্পী, কবি ।

বিজয় কি তবে. . .

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

বিজয়ের মাসে বিজয় খুঁজিছে পঙ্গু মুক্তিসেনা -
কোথায় বিজয়, যে বিজয় তার জান বাজি রেখে কেনা?
যে বিজয়ে মেশা মা, বোন, বধুর আব্রু ও সম্ভ্রম -
যে বিজয় ছিল আশা জাগানিয়া গানে ভরা; হরদম
বুকের বীণায় উঠতো জোয়ার যেই বিজয়ের নামে
সে বিজয় আজ কোথায় হারালো? কোন সেই দূর ধামে?

একাত্তরের যে বিজয় ছিল সুরভিত সুবাতাস;
দু'হাজার দশে সে বিজয় কেন কবলিত রাহুগ্রাস?
যে বিজয় ছিল স্বপ্ন, আসছে সামনে সোনালী দিন -
সেই স্বপ্নরা মরে গেছে, আজ বেঁচে থাকা সংগীন।
বাতি জ্বালানোর বিদ্যুৎ নেই, নেইকো পানীয় জল,
বাজারে বিকোয় ফর্মালিনের বিষমাখা মাছ, ফল;
চুলো জ্বালাবার গ্যাস ও অপ্রতুল; জান-যট রাস্তায়,
মলম পার্টি, ছিনতাইকারী, পথে বের হওয়া দায়।
গ্রামে ও গঞ্জে ইভ-টিজিং এর বলি কিশোরীর লাশ
নিয়ে বেঁচে থাকা বিজয়ের ফল? বিজয় কি সন্ত্রাস?

শাসনের নামে চালায় শোষণ যে বসে সিংহাসনে -
মুখেতে কথার তুবরী ফোটায় কারণে বা অকারণে,
তাদের বড়ই সহজ শ্লোগান - 'দেশ থেকে দল বড়
দল থেকে বড় নেতা-নেতৃরা, তাহাদের স্তব কর !'
নেতাদের যত জ্ঞাতি ও গোষ্ঠি, মোসাহেব, তাবেদার-
তারাই দেশের আসল মালিক; জনগণ কোন ছার?
নেতাদের কাজ চুরি-জুচ্চুরী, বিবাদ, বিসংবাদ;
অন্য দলকে গালাগাল দেয়া, নিজেকে জিন্দাবাদ।

পিতা বা পতির এ-দল ও-দল যারাই করুক রাজ;
নামকরণের প্রতিযোগিতাই তাদের প্রধান কাজ।

আরো কাজ আছে, জবর দখল সরকারী সম্পদ,
তাদের লোভের কাছে পরাজিত নদী, বন, পর্বত !
নেতা, উপনেতা, দলীয় চামচা, তারাই দেশের প্রভু;
রাষ্ট্রীয় ধন জবর দখলে পেছপা হন না কভু।
বিজয় কি শুধু দু'পরিবারের চরম খেয়ালীপনা
মেনে নিয়ে বাঁচা? মুক্তি সেনার এই শুধু জল্পনা।

কোথা সে বিজয় যে বিজয় কেনা অযুত প্রাণের দামে?
সামনে, পেছনে কোথাও সে নেই, নেই সে তো ডানে
বামে।
সে অযুত প্রাণ মরে মরে বাঁচে, জীবনের অধিকার
অন্ধ কারায় মাথা কুঁটে মরে; নাই কোন প্রতিকার।

বিজয়ের মাসে বিজয় খুঁজিছে স্বামী, সন্তান হারা
জায়া ও জননী; কোথায় বিজয়? কেউ কি দেবেনা সারা?
বিজয় মানে কি আল-বদরের পতাকা শোভিত গাড়ী?
বিজয় মানে কি দরবার হলে নিহত সেনার সারি?
বিজয় কি শুধু নতুন বোতলে পুরোনো মদের নাম ?
নতুন পতাকা? নয়া পাশপোর্ট ? না কি শুধু অবিরাম
ধুঁকে ধুঁকে মরা? বেঁচে থাকা নয়, দিনগত পাপক্ষয়?
বিজয় কি তবে অশুভের কাছে জীবনের পরাজয়?

কে দেবে জবাব তার?
ইতিহাস বলে আমার পাতায় চেয়ে দেখো একবার।
অশুভের জয় সে তো সাময়িক; বলে দেবে মহাকাল -
নতুন যুদ্ধ শুরু হবে দেখো আনতে নয়া সকাল।

০০০

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক: কবিতাপ্রেমী, কবিতা বিকেলের অন্যতম সভ্য।

আজাদুল আলম

আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি

প্যাসিফিক হাইওয়ের এক্সিট । রিভার রোড প্যাসিফিক থেকে বেরিয়ে চলে গেছে লেইনকোভ রিভারের দিকে । উচু নীচু একহারা এই রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে মনে হবে যেন শুকনো ঠনঠনে নদী পথ । এই রাস্তার দুপাশে ধনাঢ্য সব এলাকা । টম্বরীন বে রোড রিভার রোডের আড়াআড়ি । এই রোড দিয়ে এগুতে থাকলে চোখে পরবে ইয়াম্বলী আর টালিবান রোড । আমার গন্তব্যস্থান সেইন্ট ইগ্‌অনেশাহ কলেজের বিশাল গেটটি অনায়াসে চোখে পড়ে টম্বরিন আর রিভারভিউ রোডের গোল চত্তর পেরুলেই । যেমন বিশাল দরজা তেমনি বিশাল এই কলেজের আয়তন । রিভারভিউ এলাকার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে এর সগৌরব অবস্থান ।

স্কুল টিমের ক্রিকেট খেলার সুত্র ধরে এই কলেজে আসা । এই টিমের স্থির মস্তিস্ক ধীর গতি সম্পন্ন ফাস্ট বলার আমার ছেলে । তাকে নিয়ে নদী, পাহাড়, বন ঘেরা সেইন্ট ইগ্নেশাসের ৪নং মাঠটি খুজে পেতে বেশ কস্টই হোল । ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে মাঠের আশে পাশে থাকলাম না ছেলের অনুরোধেই, দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকলে পারফরমেন্স আরো নেতিয়ে পরতে পারে, এই আশংকায় আমাকে আগে থেকেই হুশিয়ারী দেয়া হোয়েছে । বিনা বাক্যব্যায়ে কথা রেখেছিলাম অন্য কারনে । সেইন্ট ইগনেশাসের দুর্দান্ত চারের মার দেখার চেয়ে আমার আকর্ষন ছিল লেইনকোভ, রিভার ভিউ, লিনলি পয়েন্ট এলাকার সৌন্দর্য ঘুরে ফিরে দেখার ।

নদীঘেরা এই এলাকাগুলোতে আদীবাসিরা হাজার বছর ধরে বাস করলেও এখন তাদেরকে চোখে পড়েনা । ইউক্যালিপটাস, গাম, লিলিপিলি গাছের ফাকে ফাকে গড়ে ওঠা বসতিগুলো ঝোপের আড়ালে যেন বাবুই পাখীর নিখুত ঠিকানা । লেইনকোভ রিভার টম্বারিন বে এবং বার্ন্স বে' র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে করেছে আরো বিস্তারিত । গাড়িটা পার্ক করলাম টম্বারিন বে রোডের শেষ মাথায় । টম্বারিন বে রিজার্ভের ভেতর

দিয়ে পায়ে চলা এবরো খেবরো পথ । ডানে সেইন্ট ইগনেশাস কলেজের বাউন্ডারী, বায়ে টম্বারিন বে এবং তার বুকে ভাসছে মাছ ধরার নৌকো, প্যাসিফিক ব্লাক ডাক, উড ডাক আর লাল প্লেজের ফায়ার টেল পাখী । ছোট বড় পাথর টপকিয়ে রিজার্ভের বেশ ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম একপ্রকার মোহাবিষ্ট হোয়েই । পাতার মরমর শব্দ, পাখীর কিচিরমিচির, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল কোন এক রেইন ফরেষ্টে বিচরন করছি। কখন যে এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে টের পাইনি । সুর্যটা মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ার সাথেই দমকা বাতাসটার বেগ খানিকটা বেড়ে গেল । ভয় পেয়েই তড়িঘড়ি জংগল থেকে বেড়িয়ে সোজা উপড়ে উঠে আসলাম ভিক্টোরি রোডের ফুটপাথে ।উঠছি নীচ থেকে উপরে । পাহাড়ি পথ বাক দিয়ে উচুতে হারিয়ে গেছে । একটা শব্দ করে স্টেট বাসটা পাশ কাটিয়ে উধাও হয়ে গেল আর এক বাকে । সামনে তাকাতেই চোখে পড়লো এক বৃদ্ধা ট্রলি ব্যাগসহ ধরাশায়ী । সম্ভবতঃ বাস থেকে নেমে দমকা বাতাসের বেগ সামলাতে পারেনি । দৌড়ে এসে সাহায্য করার আগেই বৃদ্ধা আমাকে ইংগিত করলো "আমাকে নয় আমি ঠিক আছি, পারলে গন্ডগোলের হোতা ঐ গোলগুলোকে ধরো । দেখছোনা কি রকম দৌড়ে পালাচ্ছে । ওদেরকে সামলাতে গিয়েই তো আমার এই অবস্থা"। ততক্ষনে এভোকাডো, গোল্ডেন ডেলিশাস আপেল এবং ক্যালিফোর্নিয়ান অরেঞ্জগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ঠাই নিয়েছে । হেটে যেতে চাইলেও একপ্রকার দৌড়ে গিয়ে ওগুলোকে পাকড়াও করে উপরে উঠছিলাম । বৃদ্ধার ব্যাস্ত চিৎকার " না না উপড়ে এসে কাজ নেই, আমাকেই নীচে নামতে হবে"।

বৃদ্ধা হাটা দিয়েছে ঢালুর দিকে । এগিয়ে এসে সাহায্য করবো কি না, প্রস্তাব দেয়ার আগে ও বলে উঠলো "ভাবতে হবে না আমি ঠিকই তোমার কাছে আসতে পারবো"। গোলগাল চেহারার পরিপাটি বদনের মহিলাকে এই প্রথম্ বার ভালো করে দেখলাম । আভিজাত্যের ছাপ চুল থেকে পা অবধি হলেও মুখমন্ডলে কোন গাম্ভীর্যের ছাপ নেই । সতেজ সাবলীল, স্মিত হাসির পরশে চিবুকের বলিরেখা গুলো বিনা বাহানায় লুকিয়ে রেখেছে আসল বয়সটাকে ।

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ইয়াংম্যান"।

সদ্য কলোপিত চুলের বদৌলতে ইয়াংম্যান সন্মোধনটা মনটাকে পুলকিত করলো । "দ্যাটস ওকে, তুমি ঠিক আছো তো ? যেভাবে ট্রলিব্যাগের সাথে পাঞ্জা লড়ছিলে ।

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বললো, “আমি সোফিয়া মার্গারেট এডাম, সোফিয়া এডাম নামে সমধিক পরিচিত”।

“তুমি কি বাংলাদেশী”?

কিছুটা হচকচিয়ে গেলাম । সবসময় দেখেছি এদেশীয়রা প্রথমেই ইন্ডিয়ান অথবা পাকিস্থানী ভেবে নেয় আমাদের আদলের কাউকে দেখলে ।

“হ্যা জাতে বাঙ্গালী, জাতীয়তায় বাংলাদেশী “।

“তুমি কি করে বুঝলে, আমার চেহারায় বা বেশভুশায় কোথাও কি মেইড ইন বাংলাদেশ লেখা আছে”?

“আছে মাই ডিয়ার, সামহয়্যার ইন হেয়ার ওর দেয়ার, নিজের এবং আমার বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বললো

“জানতে চাইলে আমাকে কিছুক্ষন সময় দিতে হবে যে “।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এই মহিলার রহস্যে ভরা আহবানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না ।

যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তার উলটো দিকে সোফিয়ার বাসা । নাম লোটাস হাউস । আমাকে ড্রয়িংরুমে বসতে বলে সোফিয়া হাত-মুখ ধুতে গেল । বিশাল রুমের চার দেয়াল এবং সংলগ্ন ফ্লোর স্যুভিনিরে ঠাসা । মাঝে ভেলভেটের সোফাসেট, ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের কলোজিয়াম থেকে বার্মার বুদ্ধ প্রতিকৃতিও ঠাই পেয়েছে তার কালেকশনে । ঘুরে ঘুরে দেখতেই দৃশটি আটকে গেল একটা কোনায় এসে । নাম তার বাংলাদেশ কর্নার । সবার উপরে বায়তুল মোকাররম মসজিদের ফ্রেমে বাঁধা ক্যানভাস, তার নীচে বাশের তৈরী মিটার খানেক লম্বা পাল তোলা নৌকা । পাশের প্রায় পুরোটা জুড়েই বঙ্গবন্ধুর ঐতিসাহিক ৭ই মার্চের প্রতিকৃতি । একহাত উচিয়ে স্বাধীনতার ডাক । আরো নীচে জয়নুল আবেদীনের কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ী, দুর্গা পুজার মন্ডপ, কলসি কাখে গায়ের বধু । ঠায় দাড়িয়ে ছিলাম জানিনা কতক্ষন । সম্বিত ফিরে পেলাম সোফিয়ার প্রশ্নে, “এখন কি বুঝতে পেরেছো ? প্রথম দেখাতেই তোমাকে বাংলাদেশী ভেবে নিয়েছিলাম কেন?”

“তুমি নিশ্চয় বাংলাদেশে কিছুটা সময় কাটিয়েছো?” প্রশ্ন আমার ।

"কিছুটা নয়, বলো কিছু কাল, জীবনের কয়েকটা উৎকৃষ্ট সোনালী বছর" ।

বলতে পারো বাংলাদেশ আমার সেকেন্ড হোম । উনসত্তুরের গন অভ্যুথান থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিন পর্যন্ত সমস্ত প্রধান ইভেন্টগুলোর আমি প্রত্যক্ষদর্শী ।

তারপর শুরু করলো সোফিয়া তার বাংলাদেশের কথা । স্বামীর মিশনারী মিশনের সুত্র ধরে সোফিয়ার বাংলাদেশে জীবন যাপন । ৬৯এর প্রথম দিকে সোফিয়া তার স্বামীর সাথে ময়মনসিংহ জেলায় মিশনের কাজ শুরু করে । এক ছেলে আর এক মেয়ের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার হালুয়া ঘাটে । ধানমন্ডির ১৬ নম্বর রোডের এক ভাড়া বাসায় কেটেছে ৭১এর দিনগুলো । চার বছরে অনেকটাই বাংলা রপ্ত করে নিয়েছিল সোফিয়া। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষনের প্রত্তক্ষদর্শিনী । গর্ব আর গাম্ভীর্যের সাথে সোচ্চার গলায় উচ্চারন করলো বঙ্গবন্ধুর ভাষনের কয়েকটা লাইন । আমি শুধু অবাক হোয়ে শুনছিলাম তার কথাগুলো । একজন বিদেশিনীর বাংলাদেশের জন্য কি পরিমান ভালবাসা থাকলে এতো গভীরভাবে আমার দেশের গর্বের কহিনী রক্ষন করে এবং ধারন করে স্মৃতিতে। সে বলল, তার ৮নং ফ্রিডম স্ট্রিটের বাসাটির নাম 'এডামস হাউস' থেকে পালটিয়ে রেখেছে 'লোটাস হাউস'। হাসতে হাসতে জানালো এ হোল বিজয় স্মরনীর পদ্মবাড়ী । সৃতির বন্ধনে বাধা সোফিয়ার বাংলাদেশ প্রীতি আমাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে তুলেছিল ।

"আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি । ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে, ৭০এর উৎসব মুখর নির্বাচনে, ৭১এর ৭ই মার্চে, তারপর মক্তিযুদ্ধে "। স্বাধীন বাংলা বেতারের গন-সংগীত আর চরমপত্র ছিল আমার প্রিয় অনুষ্ঠান। কতদিন কতরাত আশায় আশায় ছিলাম যদি কোন গেরিলা যোদ্ধা আসে আমার ঘরে, একটু সময়ের জন্য, এক আজল পানির জন্য; কী সৌভাগ্যই না আমার হোত ,একজন মহান মানুষের সাথে দুদন্ড কথা বলতাম, জানতাম তাদের বীরত্বগাথা । নিজের অজান্তেই তখন আমি বাঙ্গালী মনে প্রানে । তোমাদের বিজয় দেখেছি আমি ১৬ই ডিসেম্বরে । যোগ দিয়েছিলাম বিজয় মিছিলে শাহবাগ থেকে পল্টন পর্যন্ত । সে সময়টা আমার জীবনের উৎকৃষ্ট সময় । আমার তখন মনে হোত এই বাংগালীরা যারা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করলো সে দেশটাতো আমার ছেলে মেয়ের জন্মভুমি । সে বিজয়ের মিছিলে আমিও একাত্ম ছিলাম আপন হয়ে" ।

শুনছিলাম আর ভাবছিলাম আমি কি পারছি এতটা উচ্ছল আবেগে আমাদের স্বাধীনতা, বিজয় দিবস আর শহীদ দিবসকে শ্রদ্ধা জানাতে এই বিদেশের পরিবেশে ?

সোফিয়া হাপিয়ে উঠেছে এক নাগারে এতোটা কথা বলে – সঙ্গত কারনেই থামলো কিছুক্ষন ।

অশতিপর বৃদ্ধার স্মৃতিচারণ আমাকে এতোটাই আবিষ্ট করেছিল যে মনের অজান্তেই বললাম –

সোফিয়া থামলে কেন? আমার শুনতে খুবই ভালো লাগছে – আমাদের বীরত্বের কথা শুনছি একজন বিদেশিনীর মুখে।

সোফিয়া এতক্ষনে সম্বিত ফিরে বলল, এইযা তোমাকেতো চা দিতে ভুলে গেছি ।

বললাম ব্যাস্ততার প্রেয়াজন নেই আমি রোজা পালন করছি ।

ও আচ্ছা এটা তাহলে রমজান মাস ।

পাড়া পড়শীদের পাঠানো ইফতারের কাহিনী না বললে তো গল্পই শেষ হবে না , সেগুলো আর এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতির গল্প ।

এমন সময় ছেলের এসএমএস। waiting at the lost corner .

অনিচ্ছা সত্বেও বিদায় নিলাম একখন্ড বাংলাদেশ থেকে, যা ধরে রেখেছে একজন বিদেশিনী তার পদ্মবাটিতে । মনের মধ্যে সংগীতের মতো বেজে বেজে উঠলো তার একটা লাইন “আমি তোমাদের বিজয় দেখেছি”।

০০০

বিজয়

মাহমুদা রুনু

১

তার কাছে যে আমার অনেক ঋণ
কথা শেখা ব্যথা জানা,
জ্ঞানের জগৎ বাগে আনা
বিন্দু থেকে বৃত্ত ঘেরা জীবন অনুরীন ।

অসহযোগের মিছিল শ্লোগান
সংগ্রামের উতল ঝড়ে -
সে দিল মোর শৈশব গড়ে ।
৭১ এ বুলেট গাথা মৃত্যু-মাকান ।

মহেন্দ্রক্ষন এলো যখন
শেকল ভেঙ্গে রক্তপ্লাবন -
কৈশোর যেন হঠাৎ শ্রাবন
মানচিত্রের বিজয় তখন ।

মধ্যজীবন ব্যস্ত সময়
ভুগোলকের যোজন দুরে
তবুও বিজয় বাজছে সুরে
শ্বাশ্বত সে অমিয় প্রণয় ।

জীবন নদীর ফল্গুধারায়
চাঁদ-সুরুজের আসা-যাওয়ায় -
উনচল্লিশ বিজয়-দিবস
দিন-বদলের নতুন চাওয়ায় ।

তার কাছে তো আমার অশেষ ঋণ
ভালোবাসায় শুধবো এবার
আসছে শুভদিন ।
অন্যবিজয়, শুদ্ধ বিজয়,আন্যরকম দিন
শুধতে যে তার ঋণ ।

২

ধলেশ্বরী তীরে ফুলেশ্বরী গ্রাম
শান বাধানো পাকুর বেদী
স্কুলঘর, খামার, ল্যাব সাথে লাইব্রেরী
পাঠ চলে রাত অব্দী ।

আটচল্লিশ বছর ধরে তিলে তিলে
একক চেষ্টা ধ্যান-জ্ঞানে
স্বনির্ভর শিক্ষালয় শির উচু
বঙ্গইতিহাস-গনিত-বিজ্ঞানে ।

মৎস্য-গবাদী-কৃষি খামার,
বায়োগ্যাস, বাঁশে তৈরী কাগজ, শিমুল তুলো,
পাটের সুতো, তাতের বস্ত্র, মাটির পাত্র
সৌরশক্তিতে আলো ।

একজন দিদিমনি আর একটি স্বপ্ন
'স্বনির্ভর মানুষ - মুক্তদেশে' ।

গবেষনার নিস্তব্ধ মগ্নতায় -
নিমগ্ন পদার্থবিদ ;
কালরাত্রি গ্রাস করেছিল হায়নাবেশে
সে রাতের নগ্নতায় ।
ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় অন্ধকার নিমিষে ।
বন্ধুর হাত ধরে মুক্তির যুদ্ধ
জলে স্থলে অন্তরিক্ষে ।
একটি বুলেট একটি পাকুর গাছ
আচলের বিছানায় একটি মৃত্যু, অনিরুদ্ধ ।

সেইথেকে একার যুদ্ধ, একান্ত সংগ্রাম
ফুলেশ্বরী স্বনির্ভর গ্রাম ।
বীরশ্রেষ্ঠ, বীরোত্তম, বীরবিক্রম এমন
অসংখ্য পদকের সমষ্টির নাম -
''দিদিমনির স্বনির্ভর শিক্ষালয়''
এরই নাম বিজয়, অলয় ।

০০০

মাহমুদা রুনু: কবি, কবিতাপ্রেমী ও সংগঠক।

বিজয়

মমতা চৌধুরী

ছোট্ট বালিকা, বুঝিনি ‘ছয় দফা’,
৬৯র গন অভ্যূত্থানের জোড়াল বারতা;
অস্পষ্ট মনে পড়ে কত স্মৃতি, তরুন বাবার মুখচ্ছবি সনে -
রাত ভোর হয়েছে যার কর্মব্যস্ত ‘সন্তোষ সম্মেলনে’।

বুঝিনি তখনও রাজনীতি, সমরনীতির গুরুগম্ভীর কথা,
নিবেদিত প্রাণ দেশ কর্মীদের সোচ্চার একাত্বতা।
আসাদের রক্তভেজা সার্ট প্রতিবাদ প্রতীক হয়ে,
প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাজপথে, নগরে বন্দরে॥

বুঝা না বুঝার মাঝে শুনেছি ক্রন্দন মার,
৭০র জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে সন্তান যার।
একদিন প্রতিবাদি মা’কে নিয়ে গেলো শৃঙ্খল শাসনে,
‘জাগো অনশন বন্দি উঠরে জাগো’ গাওয়ার অপরাধে॥

একটি বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার উত্তাল আহ্বান -
ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে স্বাধীকারের ঐক্যতান,
জেগে উঠে নিপীড়িত জনতা মৌলিক অধিকার চেতনায়,
‘যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে’ মুক্তির সাধনায়॥

দেখেছি দলে দলে চলেছে তরুণ যুবা মুক্তিযুদ্ধে -
জীবনের বিনিময়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে।
বুকের রক্তে ধুয়ে মুছে সব সব বঞ্চনার গ্লানি,
বাংলার দামাল প্রাণেরা গাইল বিজয় জয়ধ্বনি॥

ন’মাসের অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাত আর সৃষ্টি বেদনা সয়ে,
দীপ্ত পদভরে বিজয় এলো বাংলা মায়ের ঘরে।
সহস্র শহীদের আত্মত্যাগের রক্ততিলক এঁকে,
মুক্ত হল দেশের মাটি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে॥

আজো শ্রবণে বাজে মোর ক্ষণে ক্ষণে জয়ের তোপধ্বনি,
১৬ই ডিসেম্বর অরুনাদোয়ে অগ্নিস্বাক্ষীতে শুদ্ধ আমার জন্মভূমি॥
বিশ্ব মানচিত্রে একখন্ড নিজেস্ব ভূমির পরিচয় ক্ষণ,
রোমাঞ্চিত করেছিল অপার উল্লাসে আমার বালিকা মন॥

শত কোটি অভিবাদন মোর সব মুক্তিযোদ্ধাদের তরে
শিখা অর্নিবাণ হয়ে জ্বলবে তারা বাংলার মনমন্দিরে।
তারপর এই পৃথিবীর পথে পথে, কত দেশ, জনপদে,
একটি বিজয় কাব্য মোরে অনুক্ষন উদ্ভাসিত করে॥

মমতা চৌধুরী: কবি, কবিতাপ্রেমী

একজন মুক্তিযোদ্ধার ৭১’র একদিন

জাফির হোসাইন

রাতে ভালো ঘুম হয়নি । অস্থিরতায় কেটেছে সারাটা রাত । একটু মনে হয় তন্দ্রা এসেছিলো, ফজরের আজানে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় । ফজরের নামাজটা কখনও মসজিদে পড়া হয়না । আজ যখন ঘুমটাই ভেঙ্গে গেলো মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজটা পড়ে নিলে কেমন হয় এটা ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়লো গামা । তাড়াহুড়ো করে ওজুটা করে বেরিয়ে পড়লো। বাসার সামনের রাস্তা পেরিয়ে দেওয়াল টপকালেই লালবাগ কেল্লার মসজিদ । শায়েস্তা খাঁর আমলে তৈরী । জরাজীর্ন অবস্থা । ইমাম সাহেবকে সালাম দিতেই তিনি এমন অবাক বিস্ময়ে তাকালেন যেন আমার মসজিদে আসাটা একটা অবাক করা কান্ড । ফজরের ওয়াক্তে মসজিদে আসা হয়না বটে কিন্তু জুম্মার নামাজ তো ঠিকই পড়তে আসা হয় । ছোট মসজিদ, ভেতরে পাঁচটা সারিতে জামাতে দাড়ানো যায় । জুম্মার দিন যখন মসজিদে আসি তখন ভিতরের সারিতে যায়গা হয়না । বসতে হয় বাইরে খোলা যায়গায় বন্ধুদের সাথে, যার ফলে ইমাম সাহেবের সাথে কখনও মসজিদে দেখা হয়না । মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখা হয়, সালাম দিলে জবাব দেন তবে খুব একটা পছন্দ করেন বলে মনে হয়না । লালবাগের এই দিকটাতে অনেক মাউড়া থাকে । অবাঙ্গালী উর্দুভাষীদের বন্ধু মহলে মাউড়া বলে ডাকা হতো । ইমাম সাহেব আবার এদের খুবই পছন্দ করতেন । উর্দুতে কথা বলে, কুর্তা সালোয়ার পরে, চোখে সুরমা লাগায়, ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ছাড়া কথা বলেনা । সে হিসেবে গামাকে উনি অপছন্দ করতেই পারেন ।

ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ শেষ করেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লো গামা । গামা নামটা যে কেন মা রেখেছিল তা কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি । রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়ে বড় ভাইয়ের নাম গোরা রেখেছিলেন কিন্তু গামা নামের কোন চরিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে আছে কিনা তা মা-ই ভালো বলতে পারবেন । পরে সময় করে জেনে নিতে হবে । আপাততঃ আবুলকে ডেকে তুলতে হবে । সময় নষ্ট করা যাবে না । ও ব্যাটাতো আবার বেলা দশটার আগে বিছানা ছাড়েনা । অস্ত্রটা গত রাতেই ওর সংগ্রহ করার কথা । সময় মতো ওটা না পেলে কোন কাজই হবেনা । পরিকল্পনা তেমন একটা করা হয়নি । শুধু এটুকুই জানে যে স্থানীয়

সরকার মন্ত্রী মওলানা ইসহাক লালবাগ শাহী মসজিদে নেজাম ইসলামের কর্মী সমাবেশে আসছে । সুতরাং বাগে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে না । একটা কিছু করতে হবে ।

অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যাপারে মেজর খালেদ মোশাররফের সাথে যোগাযোগের দ্বায়িত্ব আবুল এবং নিজামের । নিজেদের কাছে অস্ত্র গোলাবারুদ রাখা হয়না নিরাপত্তার জন্য । যা কিছু আছে তার সম্পুর্ন দ্বায়িত্ব আবুল আর নিজামের । ওরাই সম্ভবত জিঞ্জিরার কোন যায়গায় অথবা কারও বাড়িতে লুকিয়ে রাখে । অতিরিক্ত যা কিছু দরকার হয় খালেদ মোশাররফের কাছ থেকে তার সাপ্লাই পাওয়া যায় । খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ঢাকা ভিত্তিক একটা গেরিলা গ্রুপ চালাচ্ছে গামা-আবুল-নিজামরা । সবাই বয়সে কিশোর এবং যুবক । গামা-আবুল এখনও স্কুলের গন্ডি পেরুতে পারে নাই । নিজাম সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শুরু করেছে । এর আগেও ওরা কয়েকটা গেরিলা অপারেশন করেছে । ঘটনা ঘটিয়েই লুকিয়ে পড়েছে অথবা সাধারন মানুষের মধ্যে মিশে গেছে । পরিকল্পনা করে গুছিয়ে কোন কাজ ওরা করেনা । কিশোরসুলভ অস্থিরতা সকলের মধ্যেই কমবেশি বিদ্যমান । নিজাম কিছুটা ধীরস্থির তারপরও আবেগ তাড়িত ।

আবুলকে উঠতে হল । ও অস্ত্রটা সংগ্রহ করেছে । একটা গ্রেনেড । ওই সামান্য একটা অস্ত্র দিয়ে ওদের আজ অপারেশনটা করতে হবে । আবুল চান্দিঘাটের ছেলে । চান্দিঘাটের কিতাবি নাম চাঁদনিঘাট। মোগল আমল থেকে ওই নামে পরিচিত । লালবাগ কেল্লার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চকবাজারের দিকে গেছে সেটা দিয়ে পুর্বদিকে এগোতে থাকলে মমিন মটর পার হোয়ে খাজেদেওয়ান বাঁয়ে রেখে একটু এগিয়ে হাতের ডানে যে গলিটা ওয়াটার ওয়াক্সের দিকে গেছে সেটাই চান্দিঘাট । আবুলের পৈত্রিক বাড়ী । আবুলকে লালবাগের এই দিক্টর মানুষজন খুব একটা চেনেনা । ওয়েষ্ট এন্ড হাই স্কুলে গামার সহপাঠি । দুজনেই প্রচন্ড দুরন্ত । আবুল অপরিচিত হওয়ার কারনে সামনে থাকবে আর পিছন থেকে গামা আক্রমন করবে ।

লালবাগ চৌরাস্থার পিরুর দোকানে বসে নাস্তা খেতে খেতেই ঠিক হোল যে আবুল ওর বাবার পুরাতন ৫০সিসি মটর সাইকেল্টা নিয়ে আসবে এবং দুজনেই সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরবে । বিকেলে দুজনেই একসাথে নেজাম ইসলামের কর্মী সামাবেশে যোগ দিবে এবং সুযোগ বুঝে ইসহাকের গাড়ীর বহরে মটর সাইকেল নিয়ে ঢুকে পরবে । এটুকুই আপাততঃ প্লান ।

গামার অস্থিরতা যাচ্ছেনা । গ্রেনেড ছোড়ার নিয়ম শিখেছে কিন্তু বাস্তবে কখনও ছোড়ে নাই, অনেক সময় নাকি গ্রেনেড বাস্টও হয়না । তাছাড়া লালবাগ চৌরাস্তায়, কেল্লার মোড়ে, গোড়াশহীদ মাজারের সামনে সবসময়ই পাকিস্থানী মিলিটারী থাকে, মাঝে মাঝে চেক পয়েন্টও বসায় । ধরাখাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, এলাকার মাউড়াগুলার সাথে বন্ধুত্ব নাই । ওগুলোর আবার ইদানিং বেশি বাড় বেড়েছে । বেশিক্ষন বাড়ীতে না থাকলে মা আবার খোজ খবর করতে শুরু করবেন । মহল্লার বন্ধুদের সময় দিতে হয় । ওদের চিন্তার গন্ডি লালবাগের বাড়ি আর চকবাজারের ব্যাবসা পর্যন্ত, দেশে কোথায় কি হচ্ছে তার খবর রাখেনা । খবরের কাগজ কেউ কখনো পড়েনা । আড্ডায় বসে যা একটু খোঁজ খবর নেয় । সময় মত আড্ডায় না গেলে আবার কেউ সন্দেহ করতে পারে । হঠাৎ করে নেজাম ইসলামের কর্মী সমাবেশে যেতে দেখলেও সমস্যা । সমস্যার শেষ নেই ।

বাড়িতে দুপুরে ভাত খেয়ে, মায়ের চোখ ফাকি দিয়ে, চটের ব্যাগের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবী নিয়ে কিল্লার মোড়ের সুবলের দোকান থেকে কাপড় ইস্ত্রি করে চান্দিঘাটের উদ্দেশ্যে বের হোল গামা । সুবলের দোকান নামেই, আসলে ওটা এখন মাউড়া গুড্ডুর দোকান । ২৫শে মার্চের পর থেকে সুবলদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা । যদিও গুড্ডু বলেছে যে সুবল তার কাছে দোকান বেচে ইন্ডিয়া চলে গেছে তবে সবাই সন্দেহ করেছে গুড্ডু সুবলদের সবাইকে মেরে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে ।

কিল্লারমোড় থেকে কোন মিলিটারির গাড়ী চোখে পড়লনা । মনে হয় শাহী মসজিদের দিকে আস্তানা গেড়েছে । কিল্লারমোড় থেকে শাহীমসজিদের পিছন দিয়ে, পোস্ত পার হয়ে রহমতগঞ্জ হাতের ডানে রেখে যখন চান্দিঘাটে আবুলদের বাসায় পৌছালো তখন প্রায় আসরের ওয়াক্ত । তাড়াহুড়ো করে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে, কিস্তিটুপি পাথায় দিয়ে দুবন্ধু মটর সাইকেল নিয়ে শাহীমসজিদের উলটোদিকের গলির মুখে গিয়ে দাড়ালো এবং অপেক্ষা করতে লাগলো কখন ইসহাক মিটিং শেষ করে ফিরবে । খেয়াল করে দেখলো রাস্তায় কেউ সন্দেহ করছেনা, নেজাম ইসলামের কর্মী সমাবেশ, কর্মীরা মটর সাইকেল নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রির নিরাপত্তা দিতেই পারে । আসরের নামাজের পর সমাবেশ শেষ হয় । ইসহাক তার পতাকা উড়ানো গাড়িতে চড়ে লালবাগ চৌরাস্তা পার হোয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে রওনা হয় । একটা জিপ গাড়ী, সামনের বামদিকে মওলানা ইসহাক পিছনে ৫/৭ জন কর্মী । তার পিছনে একটা আর্মির গাড়ী, ১০/১৫ জন পাক আর্মি । গামা আর আবুল মটর সাইকেল নিয়ে অদের পিছনে রওনা হয় । আবুল মটর সাইকেল চালাচ্ছে, গামা পেছনে । মওলানার গাড়ী লালবাগ চৌরাস্তা পার হোয়ে আজাদ অফিস বামে রেখে ডান দিকে বোর্ড অফিসের রাস্তা ধরে এগোতে

লাগলো । এখন যদি কেউ লালবাগ থেকে বের হয়ে গুলিস্থান কংবা মতিঝিলের দিকে যেতে চায় তারা সরাসরি পলাশীর মোড় পার হয়ে যেতে পারে । কিন্তু আগে ঐ রাস্তাটি ছিলোনা । ফুলবারিয়া থেকে বুয়েটের পেছনদিক দিয়ে জহুরুল হক হল ডানে রেখে হাতিরপুল দিয়ে পুরাতন রেললাইন ছিল । যার ফলে লালবাগ থেকে মতিঝিলের দিকে যেতে হলে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড-এর সামনে দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পার হোয়ে যেতে হোত । গামা-আবুল সেই পথ দিয়ে ইসহাক মওলানাকে ফলো করছে। ইসহাকের গাড়িটা যখন গলি রাস্তার মাথায়, ঢাকা মেডিকেলের কোনায় এসে সামান্য স্লো কর বাম পাশে নিয়ে আসে । আবুল তার মটর সাইকেলের গতি সামান্য বাড়িয়ে আর্মির গাড়িটা ওভেরটেক করে মওলানার গাড়ির বাম পাশে নিয়ে আসে। মওলানা একবার বাম দিকে তাকিয়ে আবুল-গামাকে দেখে নিজাম ইসলামীর কর্মী ভেবে মাথা দুলায় । এরই মধ্যে কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগে গামা তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে গ্রেনেড বের করে ক্লিপটা খুলে মওলানা ইসহাকের কোলের উপর ফেলে দেয় । আর আবুল মুহুর্ত দেরী না করে বাঁদিকের ছোট গলির ভেতর দিয়ে হাওয়া ।

পাঠক, একটা ছোট গল্পের মত করে একটা সত্যি ঘটনাকে সাজাতে চেষ্টা করেছি । স্বধীনতার পর দৈনিক বাংলা পত্রিকায় এই ঘটনা এবং এরুপ আরও অনেক ঘটনার বর্ননা বিচ্ছুদের কাহিনী শিরোনামে পড়েছি । জাহানারা ইমাম তাঁর একাত্তরের দিনগুলিতে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন । আর সবচেয়ে বড় কথা এই বীর মুক্তি্যোদ্ধার কাছে তার অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরন শুনেছি এই সিডনিতে বসে, যিনি এখন তার কন্যার কাছে বেড়াতে এসেছেন । আমি এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে গ্রেনেড ছোড়ার পরে কি হোয়েছিল । উনি খুবই স্বভাবিক ভাবে বর্ননা করলেন যে বোমা ফুটবার আগেই মওলানা ইসহাক ইয়া আল্লাহ বোমা বলে চিৎকার করেছিলেন আর এটা শুনে পিছনের গাড়ির আর্মিগুলো গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে মাটিতে শুয়ে পজিশন নিয়ে ছিলো, কেউ তাদের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করে নাই । পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেরেছলেন যে মওলানা ইসহাক মারাত্মক আসত হোয়ে হাসপাতালে তার একটা পা উরে গেছে আর সিটে বসা দুজন নিহত হোয়েছে ।

পাঠক এই বীর মুক্তিযোদ্ধা আমার অতিপ্রিয় ছোটমামা ।

বিজয়ী

সাফরিনা ফরিদ প্রীতি

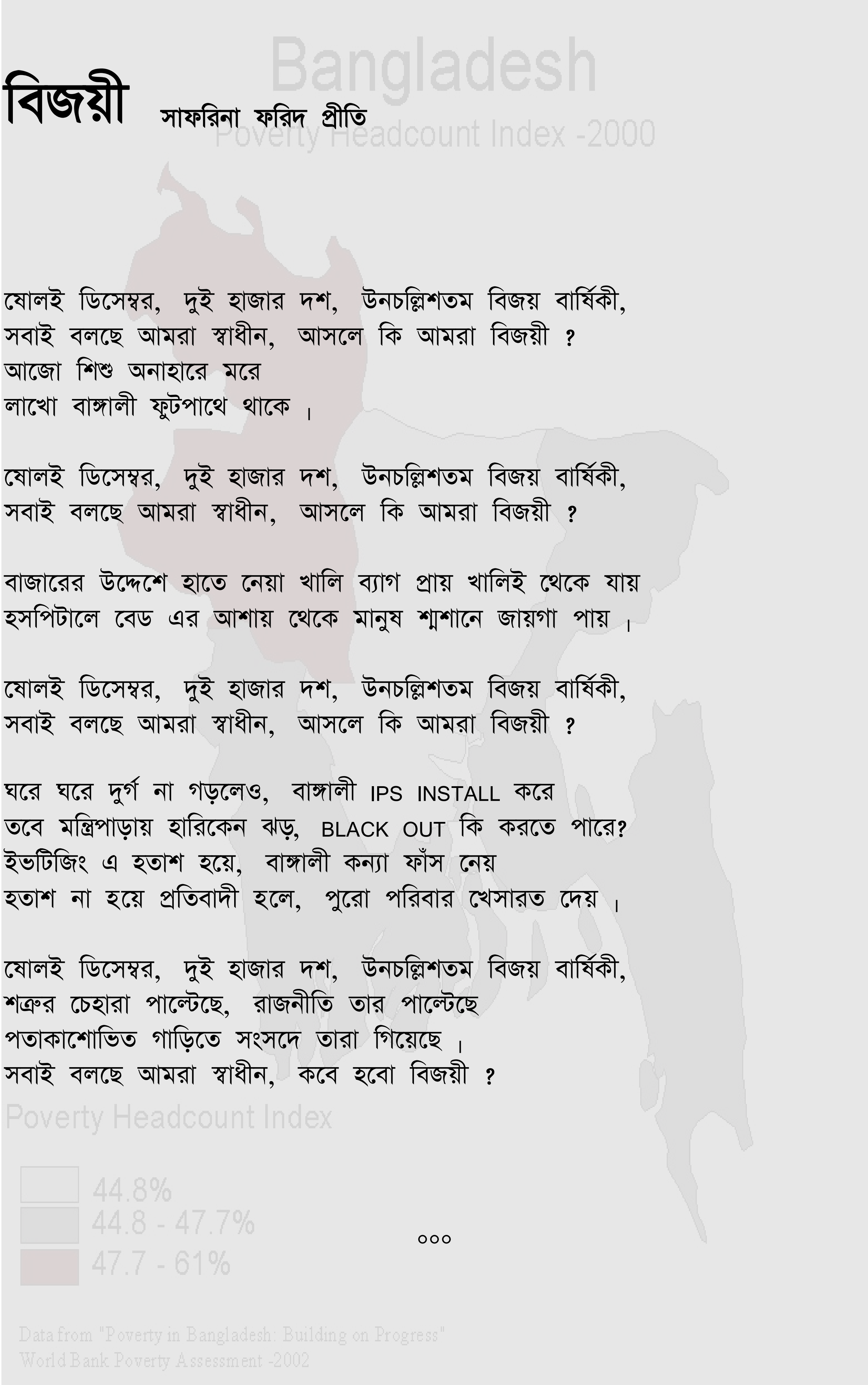

ষোলই ডিসেম্বর, দুই হাজার দশ, উনচল্লিশতম বিজয় বার্ষিকী,
সবাই বলছে আমরা স্বাধীন, আসলে কি আমরা বিজয়ী ?
আজো শিশু অনাহারে মরে
লাখো বাঙ্গালী ফুটপাথে থাকে ।

ষোলই ডিসেম্বর, দুই হাজার দশ, উনচল্লিশতম বিজয় বার্ষিকী,
সবাই বলছে আমরা স্বাধীন, আসলে কি আমরা বিজয়ী ?

বাজারের উদ্দেশে হাতে নেয়া খালি ব্যাগ প্রায় খালিই থেকে যায়
হসপিটালে বেড এর আশায় থেকে মানুষ শ্মশানে জায়গা পায় ।

ষোলই ডিসেম্বর, দুই হাজার দশ, উনচল্লিশতম বিজয় বার্ষিকী,
সবাই বলছে আমরা স্বাধীন, আসলে কি আমরা বিজয়ী ?

ঘরে ঘরে দুর্গ না গড়লেও, বাঙ্গালী IPS INSTALL করে
তবে মন্ত্রিপাড়ায় হারিকেন ঝড়, BLACK OUT কি করতে পারে?
ইভটিজিং এ হতাশ হয়ে, বাঙ্গালী কন্যা ফাঁস নেয়
হতাশ না হয়ে প্রতিবাদী হলে, পুরো পরিবার খেসারত দেয় ।

ষোলই ডিসেম্বর, দুই হাজার দশ, উনচল্লিশতম বিজয় বার্ষিকী,
শত্রুর চেহারা পাল্টেছে, রাজনীতি তার পাল্টেছে
পতাকাশোভিত গাড়িতে সংসদে তারা গিয়েছে ।
সবাই বলছে আমরা স্বাধীন, কবে হবো বিজয়ী ?

০০০

রাজন নন্দী

সূর্যাস্ত এবং আমাদের অসমাপ্ত যুদ্ধের আখ্যান

তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম মাটি থেকে অনেক উপরে,
তাজিনডংয়ের চূঁড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দিবসের নির্ধারিত মৃত্যু।
এরপরে একই ট্রেনে দীর্ঘ পথ, পাশাপাশি।
পৌঢ় ভদ্রলোক, কথা বলবার ঢংটাও বেশ টানে;
কিংবা তার সত্য কথনেরই অমন জাদুকরী সম্মোহন!
কথোপকথনের এক পর্যায়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন,
মানচিত্রের ভীর ঠেলে উঠা কোন ভূঁইফোঁড় তো নয় আমাদের স্বাধীনতা।
ন'মাস, তারও আগে দু'শ বছরের দাসত্ব শৃঙ্খল।
সেই কোন অস্তযুগে স্থলিত শৌর্য্যের হাত ধরে এসেছিল।
তবুও স্বাধীনতা এসেছে স্বপ্নের ছদ্মবেশে, আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি বারবার ।
পৃথিবীর কোন মা কি জন্ম দিয়েছে সাড়ে সাতকোটি সংসপ্তক আজও
কোন দেশে কি আবাল বৃদ্ধ বণিতা লড়তে - মরতে বলেছে 'জয়বাংলা'।
কোথায় অহর্নিশি মানুষ গেয়েছে- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' !
তার কণ্ঠে তখন স্পষ্ট উত্তাপ।
পরিণত বয়সে সব জেনে বুঝে গিয়েছিলেন মুক্তির যুদ্ধে
নিয়ে ফিরেছিলেন স্বাধীনতার সেই কাঙ্খিত সূর্য।
আর এখন তিনি প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখেন!

ঢাকায় ফিরতে ফিরতে রাত ভোর।
কমলাপুর থেকে ফিরছি ক্যাম্পাসে।
তখনও আমার শহরে রিকশার ছিল অবাধ যাতায়াত।
ওটা যখন 'পঙ্খিরাজের লাহান' উড়ছে
আমার পাহাড় ফেরত মুসাফির মন তখন বিবশ !
ভোরের তাজা কাগজের প্রথম পাতায় দেখি -
বঙ্গভবন থেকে ফিরছে এক রাজাকার।
গত রাত থেকে সে জোট সরকারের মন্ত্রী !
তার বিকশিত দাঁত গুলোতে আমি দেখি হায়নার উল্লাস।
আর তারই গাড়িতে অবনত আমার অসহায় জাতীয়তা।
হায়! এমন অসহায় আর কোন দিন মনে হয়নি নিজেকে।
বুকের ভেতর দলাদলা কান্নার মত কিছু উঠে আসে।
আমি জানি আমার কান্নায়, দ্রোহে কিচ্ছুটি হবে না বিচ্ছুদের
তবুও আমার নূরালদীনের মত চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে,
' জাগো বাহে কোনঠে সবাই'।

আরও একবার গ্রন্থিত হয়ে দ্রোহে, এস বিনাশ করি হায়নার উল্লাস।
এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে।
সূর্যাস্তের গ্লান্তি থেকে নতুন প্রভাত আনতে হবে।
কে যাবে, কে কে যাবে? এস।

কবিতা বিকেল' র পরবর্তী আসর

২৬ মার্চ ২০১১

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও বৈশাখ বরণ